বাংলার নচিকেতা

গল্প-দাদা

প্রকাশক—
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র
৫১।১, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৩৯

প্রকাশক—

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

৫১।১, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

প্রফুল্ল আমায় খুব ভালবাসত, আমিও তা'কে খুব ভালবাসতুম। কেউ কাউকে কখনও দেখিনি বা দেখবার অবসরও হয়নি। সুধু যে, আমায় ভালবাসত তা নয়, প্রফুল্ল না দেখে, বেতারের হাজার হাজার ভাই-বোনদের নিজের ভাই-বোনের মতই ভালবাসত। তার প্রাণটা ছিল এত বড় যে সারা বাঙ্গালার ছেলে-মেয়েদের জন্যও ভাবত।

জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ না থাকলে মানুষ মানুষকে না দেখে এত ভালবাসতে পারে না।

প্রফুল্ল ছিল আরতির ধূপ। সুগন্ধ বিলিয়ে চলে গেছে। নিয়ে গেছে বাপ, মা, ঠাকুমা, ঠাকুরদাদার মন আর বাঙ্গলার বেতারের ভাই-বোনেদের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা; কি বাঁধনেই তাদের বেঁধে দিয়ে গিয়েছে!

আজ তাই প্রফুল্লর এই ক্ষুদ্র জীবনী বাঙ্গালাদেশের ছেলে-মেয়েদের হাতে দিলাম।

ভূমিকা

যখন বাংলাদেশে প্রথম নাগরিক জীবনের সূচনা হ'চ্ছিল, সেই সময় একটী ছোট দশ বছরের ছেলে স্কুল সোসাইটীর স্কুলে এসে ১৮২১ খৃঃ অব্দে ভর্ত্তি হ'ল। সে হ'ল আজ একশ' এগার বছরের কথা।

তখন কলিকাতা ঠিক এই রকম ছিল না এবং স্কুল কলেজও ছিল না বল্লেই হয়। এমন কি মিউনিসিপালিটী বলেও বড় বিশেষ কিছু ছিল না। লটারী ক'রে যে টাকা উঠ্‌ত তাই থেকে ময়লা ফেলার খরচ হ'ত। তাকে লোকে লটারী কমিটি ব'লত। যারা লটারী পেত বড়লোক হ'য়ে যেত। লাখটাকা অবধি প্রাইজ ছিল। মিঃ টেরেটা ব'লে এক সাহেব নাকি একলাখ টাকা পান এবং সেই টাকায় জায়গা কিনে এক বাজার বসান তাই বাজারটীর নাম হ'ল টেরেটার বাজার। যাকে আমরা টেরিটী বাজার বলি।

রাস্তা-ঘাটগুলো যে বড় বিশেষ রকম সুবিধাজনক ছিল তা নয়। কলিকাতার ভিতর দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গা জল, নালা, নর্দ্দমা, পগার দিয়ে যাতায়াত করত।

"ক্রীক্ রো" নাম এখনো তার সাক্ষ্য দিচ্চে। এই রাস্তা দিয়ে গঙ্গাজল, ইন্টালির কাছে নোনাখালে (Salt Lake) যাহা এখন পাঁচ-ছয় মাইল দূরে চলে গেছে—তাইতে গিয়ে পড়ত।

নগরের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না। মশা ও মাছির এত অত্যাচার ছিল যে কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখে ছিলেন,

"দিনে মশা রেতে মাছি
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।"

ছোট-খাট স্কুল দু-একটী এ-পাড়া ও-পাড়ায় অবশ্য ছিল কিন্তু প্রকৃত স্কুল বল্‌তে মাত্র দুটী! একটী প্রতিষ্ঠিত হল ১৮১৫ খৃঃ অঃ; তার নাম হ'ল হিন্দু কলেজ, যাকে এখন হিন্দু স্কুল বলে। আর একটী হ'ল ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের স্কুল। প্রতিষ্ঠিত হ'ল ১৮২১ খৃঃ অব্দে। তার নাম হ'ল, স্কুল সোসাইটীর স্কুল যাকে আমরা হেয়ার স্কুল বলি।

ছেলেটীর ইতিবৃত্ত হ'ল, গ্রাম্য পাঠশালার নিদ্রাতুর গুরুমহাশয়, তখনকারের চলিত শাস্তি অনুসারে, ছেলেটীকে বস্তা বা ছালার ভিতর প্রবেশ করাবার চেষ্টা করায়, বালকটী মহিষাসুরের মত "অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্তএবাসুর" অবস্থায় সহপাঠীদের কাহিল করে এবং কথিত আছে সব্যসাচীর

মত গুরুদেবের পাদদেশের উদ্দেশে একটী ভারি রকমের লোষ্ট্র ত্যাগ ক'রে দ্রুত পদবিক্ষেপে পাঠশালার গৃহ হইতে অবসর গ্রহণ করে। গুরু প্রণামী লোষ্ট্রটী লক্ষ্য-ভেদ করিয়াছিল কিনা তা জানা নাই।

বালকটীর বাড়ী কোন্নগর। বিখ্যাত মন্দিরবাটী মিত্র বংশের ছেলে। তেজী, মেধাবী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্কুল সোসাইটীর স্কুলে প্রবেশ ক'রবার দুই বৎসরের ভিতর হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হবার অধিকার লাভ কোরে, ডি, রোজিও হ্যালফ্যাক্স এন্সলী ও অন্যান্য বিখ্যাত শিক্ষকদের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের ভিতরই মাসিক ষোল টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহা তখন-কারের সময়ে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ছিল। লেডী বেনটিঙ্কের সম্মুখে লাট-প্রাসাদে ৺রামতনু লাহিড়ী, ৺রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সহিত সেক্সপিয়র আবৃত্তি করেন। তাঁহার সঙ্গে আর যাঁরা ছিল ও কে কি অংশ নিয়েছিলেন তার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

আবৃত্তি :—

এলেকজাণ্ডার	বিনায়ক ঠাকুর
ডাকাত	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
রিডার	রাজকৃষ্ণ মিত্র

সার্ হ্যারি	গৌরচাঁদ দে
ব্রুটাস	
সিজরের মৃত্যুতে	নরসিংহচন্দ্র বসু
ব্রুটাস	রামতনু লাহিড়ী
কেসিয়াস	দিগম্বর মিত্র
ম্যাক ডাফ	কৈলাশ দত্ত
ম্যাল্‌কম্	রামগোপাল ঘোষ
রস্	মহেশচন্দ্র সিংহ
বিলেরিয়াস্	শিবচন্দ্র দত্ত
গুইডেরিয়াস্	রাধানাথ শিকদার
আরভি রেগস্	রসিকচন্দ্র মুখার্জ্জী
দি রেজর সলের	হরিহর মুখার্জ্জী
ক্যাটোস সলিলকি	তারকনাথ সোম
হোরেসিও	কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
ফ্রানসিস্‌কো	যাদবচন্দ্র সেন
বারনায়ডো	বেণীমাধব ঘোষ
মার্‌সেলাস	পিয়ারীমোহন সেন
ভূত	অমৃতলাল মিত্র
হ্যাম্‌লেট	হারুচরণ ঘোষ
হোরেসিও	রসিককৃষ্ণ মল্লিক

মার্‌সেলাস	গোপাল মুখার্জ্জী
হ্যাম্‌লেট	কৃষ্ণধন মিত্র
হোরেসিও	কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
মার্‌সেলাস	রামচন্দ্র মিত্র

ইংরাজীতে এমন অসাধারণ দখল ছিল যে ইংরাজী-রচনা প্রতিযোগিতায় স্বধু তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন তা নয়, তাহার রচনাটী ডেভিড হেয়ার সাহেব তখনকার শিক্ষা বিভাগের সম্পাদক সাদারলাণ্ড সাহেবকে দেখান। সাদারলাণ্ড সাহেব তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হন যে, একজন ভারতীয় বালক এমন উচ্চাঙ্গের ইংরাজী ("Superior English") লিখিতে পারে। উত্তরকালে এই সাদার লাণ্ড সাহেব এই বালকের অন্যতম পৃষ্ঠ-পোষক হন। এমন একদিন এসেছিল যে এই গ্রাম্য বালক, সাদারলাণ্ড সাহেবের একজিকিউটার মিঃ গারস্‌টিন—যাঁর নাম অনুসারে কলিকাতার গারিস্‌টিন প্লেস্ রাস্তার নাম হইয়াছে—তার কাছ থেকে নিলামের সর্ব্বোচ্চ মুল্যে সাদারলাণ্ড সাহেবের জমিদারী লাট দেবীপুর খরিদ করেন।

কালে এই বালক দুই লক্ষ বিঘা জমিদারীর জমীদার, ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিঁয়াশনের একজন স্থাপয়িতা,—

বাংলার এপিডেমিক কমিশনের কমিশনার, উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদিগের রক্ষাকর্ত্তা,—বাংলার বন্যা পীড়িতের সাহায্যকারী কলিকাতা মিউনিসিপাল স্বায়ত্তশাসনের একজন অন্যতম প্রবর্ত্তক, জনসাধরণের প্রিয়পাত্র ও তৎ প্রতিনিধি—সরকার বাহাদুরের বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাভাজন, নির্ভীক কর্ম্মী ও সৎ বক্তা—সাহিত্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য, নাগরিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচত হ'ন।

এই গ্রাম্য বালক, নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা, নিজের পরিশ্রমে নিজের ডান-হাতের জোরে শত শত বাধা-বিঘ্ন স্বত্ত্বেও প্রভূত ধন অর্জ্জন করে, বহু সাধারণ হিতকর কার্য্য করে সরকার কর্ত্তৃক রাজা উপাধীতে ভূষিত হন।

এঁরই নাম রাজা দিগম্বর মিত্র সি, এস্-আই।

প্রায় একশ' বছর হয়, এখনও অবধি তাঁহার সুযোগ্য পৌত্র কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর ও তৎ পুত্র স্বহৃদয় শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয়, রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় ও দাতব্য ভোজনাগার বহু ব্যয়ে পরিচালনা করিতেছেন। একশ' বছর ধরিয়া কত শত শত নিরন্ন দরিদ্র ছাত্র এই ভোজনাগারের সাহায্যে দিনপাত করিয়া কলিকাতায় লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াঁছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিপন্ন দরিদ্র দুঃখী সাহায্যপ্রার্থীর জন্য সব সময়ই ঝামাপুকুর রাজবাটীর দ্বার উন্মুক্ত। প্রার্থী বিফল-মনোরথ হইয়া রাজবাটী হইতে ফেরে না।

এই রাজবংশে বাংলার নচিকেতা প্রফুল্লর জন্ম।

বাংলা দেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা প্রফুল্লকে কত ভালবাসত, প্রফুল্লর অকাল-মৃত্যু তাদের ছোট্ট বুকে কত আঘাত দিয়েছিল, কেমন ক'রে তারা নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে চায় যে তাদের প্রফুল্ল তাদেরি আছে, তাহা বেতারের একটা ছোট্ট মেয়ের রচিত এই গানটী, যাহা প্রফুল্ল-স্মৃতি প্রতিযোগিতায় বেতারে গীত হইয়াছিল তাহা থেকে বুঝা যায়।

এই গানের রচয়িতা হ'ল কুমারী আশালতা বসু।

সুর—কালাংড়া

মরমে মরমে বেঁধেছিনু তোমা
দেখিনে যদিও নয়নে
সে কোন প্রলয় লয়ে গেল টেনে
রহিলে শুধুই স্মরণে
এস এস ভাই বুকে করে রাখি
আধ আলো আঁধ আঁধারে নিরখি

আমরা তোমারে রাখিব বাঁচায়ে
অমর করিব মরণে
দেখিনে যদিও নয়নে
বড় আদরের ভাই তুমি মম
ছিল প্রফুল্ল-ফুল-দল-সম
দয়াল নয় সে ভয়াল ঠাকুর
হরে নিল হৃদি-রতনে
দলিয়া জনক জননী-হৃদয়
চলিয়া যাইলে কেমনে

ভ্রম-সংশোধন

৮ পৃষ্ঠায় ২৪শে জানুয়ারী ১৯১৬ খৃঃ অঃ হইবে।

প্রফুল্লকুমার মিত্র

বাংলার নচিকেতা

হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রতি বনভূমি তপোভূমি ছিল। তখন যাগ, যজ্ঞ, হোম, সকল কাজের ভিতর প্রধান কাজ ছিল। আর গরু-বাছুর ছিল সেকালের মানুষের প্রধান সম্পদ। ঋষিরা করত যজ্ঞ—আর লোকেরা করত কাজ-কর্ম্ম। ঋষিরা যে কাজ-কর্ম্ম চাষ-বাস করতনা, তা নয়। সময় সময় তাঁরা তাও করতেন।

একবার এক ঋষি তাঁর নাম হল বাজশ্রবা, তিনি এক যজ্ঞ করলেন। সে যজ্ঞের নাম হ'ল বিশ্ববেদা। সে যজ্ঞের নিয়ম হ'ল সর্ব্বস্ব দান। বড় কঠিন যজ্ঞ—যে সে করতে পারে না।

ঋষি যজ্ঞ করতে বসলেন। যজ্ঞ সমাপন হল। তখন উপস্থিত শত শত ব্রাহ্মণদের তিনি দান করতে আরম্ভ করলেন। একে একে তাঁর যত জিনিষ-পত্র গরু-বাছুর সব দিতে লাগলেন। মহাসমারোহ—হৈ হৈ ব্যাপার পড়ে গেছে। ঋষি প্রাণ খুলে আজ তাঁর সর্ব্বস্ব

দান করছেন। তাই দেখে তাঁর একমাত্র ছেলের মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছে। সে যজ্ঞভূমির একদিক থেকে অন্য দিক অবধি ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করছিল।

ঋষিকুমারের নাম হল নচিকেতা। আট নয় বছরের ফুট্‌ফুটে ছেলে। টক্‌টক্‌ করছে রং—গালগুলো ফুলো-ফুলো—টানা-টানা বড় বড় চোখ,—মাথায় কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া কাল চুল পিঠের উপর এসে পড়েছে। পরণে পীতরংয়ের কাপড়, গলায় পীতরংয়ের উত্তরীয়—পৈতের মত গলা থেকে কোমরের কাছেতে গিঁট দেওয়া ঝুল্‌ছে।

হঠাৎ কি তার খেয়াল হ'ল। দৌড়ে বাজশ্রবা যেখানে বেদীর উপর বসে দান করছিলেন, সেখানে এসে নচিকেতা জিজ্ঞাসা কল্লে—"বাবা! তুমি সর্ব্বস্ব দান কর্‌ছ। আমায় কাকে দান করবে?" ঋষি তখন দানে ব্যস্ত, বল্লেন—"এখন যাও।"

বাবার কথা শুনে ছুটে গেল সে যেখানে তার বাবার গরু-বাছুরগুলো বাঁধা ছিল। সে গরু-বাছুর-গুলোকে বড় ভালবাস্‌ত। অন্য ঋষিকুমারদের সঙ্গে ঘাস, লতা-পাতা এনে তাদের খাওয়াত। তাদের গায়ে হাত বুলাত, তাদের সঙ্গে খেলা করত, কতনা তাদের যত্ন করত।

আজ চিরকালের মত তারা চলে যাচ্ছে। কে তাদের খাওয়াবে—কে যত্ন করবে—নচিকেতার হল মহা ভাবনা। সে আবার দৌড়াল যজ্ঞভূমিতে, যেখানে বেদীর উপর বসে তার বাপ দান কর্‌ছেন। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"বাবা, আমায় কাকে দান কর্‌বেন?"—ইচ্ছা, তাকে যদি তার বাপ কোন ব্রাহ্মণের হাতে, গরুর সঙ্গে দান করেন। তাহ'লে সে গরু-বাছুর-গুলোকে ঘাস-টাস্ খাওয়ায়, বেশ মোটা-সোটা করে। এইরকম বার-বার এসে নচিকেতা জিজ্ঞাসা করে আর ঋষি বিরক্ত হয়ে তাকে ফিরিয়ে দেন।

ক্রমে ক্রমে যজ্ঞ শেষ হয়ে যাচ্চে—বাকী গরু-বাছুর তাও দান হয়ে যাচ্ছে দেখে—ছুট্‌লো নচিকেতা আবার তার বাবার কাছে—উদাত্য বেদমন্ত্রধ্বনি স্তব্ধ করে উচ্চকণ্ঠে বল্লে—"বাবা সব যে শেষ হয়ে গেল আমায় কাকে দান কর্‌লেন?" দানের মন্ত্র তখনও বাজশ্রবার কণ্ঠে শেষ হয় নি—ঋষি বিরক্ত হয়ে দানের মন্ত্র শেষ করে—রেগে বল্লেন—"যমকে।"

উপস্থিত অন্যান্য ঋষিরা "হা হা" করে উঠ্‌ল—"কি কর্‌লেন—কি কর্‌লেন" বলতে লাগল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মৃত্যুর করাল-ছায়া ঋষিকুমারের সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন

ফেল্লে। বড় আদরের নচিকেতাকে সভয়ে ঋষি বুকের ভিতর টেনে নিলেন। যে হাত দিয়ে তিনি একটু পূর্ব্বে তাঁর সর্ব্বস্ব দান করেছেন, যেন সেই পুণ্যময় হাত দিয়ে স্নেহের দুলাল নচিকেতাকে আজ যমের হাত থেকে বাঁচাবেন।

নচিকেতার ফুট্‌ফুটে রং, ফুলো-ফুলো, লাল, গোল-গোল গালদুটী মলিন হতে লাগল। ঋষি তার সব পুণ্যের বিনিময়ে নচিকেতার প্রাণ বাঁচাতে চাইলেন।

কিন্তু আট বৎসরের ঋষিকুমার তার কুসুম-কোমল বাহু দিয়ে, বাপের গলা নিজের মুখের কাছে টেনে এনে তাঁর কাণে কাণে বল্লে—"বাবা তা কি হয়। তোমার অধর্ম্ম হবে, তুমি আমায় যমকে দান করেছ। আমি মৃত্যুকামী আমায় ফিরিও না। তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করতে পার্‌ব বলে আমার আজ আনন্দে বুক ভরে উঠ্‌ছে। আমি বাঁচতে চাইনা। আমি যমের কাছে যাব। এখন আমার উপর আর কারও অধিকার নেই। যম যা বল্‌বে তাই কর্‌ব। আমি শীঘ্র শীঘ্র যেতে চাই। আমায় বাধা দিও না।"

হাস্‌তে হাস্‌তে বাপের গলা জড়িয়ে, বাপকে সান্ত্বনা দিতে, তাঁর বিষাদ-কাতর সজল চোখের দিকে

চাইতে চাইতে, নচিকেতার মাথাটি বাপের কোলে ঢ'লে পড়ল, আর তার কোঁক্ড়া চুলের রাশি আলু-থালু ভাবে বেদীর ভূমিস্পর্শ করে সন্ধ্যার বাতাসে লুট্‌তে লাগল। বাপ তার মৃতদেহ বুকের ভিতর করে বসে রইল আর নচিকেতা একেবারে যমের বাড়ী গিয়ে হাজির হল।

ভারতবর্ষ ছাড়া আর এরকম দৃষ্টান্ত, জগতের কোন জাতির কোন যুগের ইতিহাসে মেলে না।

আট বছরের ছেলে, যমকে ভয় করে না, মৃত্যুকেও ভয় করে না, বাপকে বুঝিয়ে যমের সন্ধানে যায়—উপনিষদের এই কাহিনী গল্প বা রচনা নয়—এটী খুব সত্যি কথা। এরূপ অপাপ-বিদ্ধ শুদ্ধ আত্মা,—আমাদের অজানিত—বিশ্ব-নিয়ন্তার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে, যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন এবং নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হলে, সকলকে তাঁর কাজে-কর্ম্মে, কথায়-বার্ত্তায়, গুণে-জ্ঞানে, মুগ্ধ করে আবার যে দেশ থেকে এসেছিলেন, সেই দেশেতে সকলকে কাঁদিয়ে চলে যান—তার দৃষ্টান্ত কম হলেও বিরল নয়।

আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে এইরকম একজন নচিকেতা জন্মগ্রহণ করেছিল। নচিকেতার মতনই ফুট্‌ফুটে ছেলে সে। টানা-টানা চোখ, গালগুলো লাল

টুক্‌টুকে, ফুলো-ফুলো। কাল মেঘের মত কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল। নচিকেতার মতনই জ্ঞানী—ত্যাগী—মৃত্যুকামী।

সে হ'ল বাঙ্গালার নচিকেতা—তার নাম হল প্রফুল্ল। নচিকেতা ছিল ঋষি-কুমার, আর প্রফুল্ল হ'ল রাজকুমার। কিন্তু দু'জনারই প্রাণ—পরের জন্য—পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু সকলের জন্য সমানভাবে কাঁদ্‌ত। উপনিষদের নচিকেতা, মুহূর্ত্তের মধ্যে মৃত্যুকে আনন্দময় রূপে বরণ করে নিয়েছিল, আর বাঙ্গলার নচিকেতা দুই বছর ধরে, মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে সেইরূপ সাদরে বরণ করে নিয়ে ছিল।

এই প্রফুল্ল কে? প্রফুল্ল ছিল রাজার ছেলে, রাজ-প্রাসাদে মানুষ। কিন্তু ঐশ্বর্য্য এই দেব-শিশুর মন আকৃষ্ট কর্‌তে পারেনি। প্রাণটা ছিল তার আকাশের মত খোলা। দীর্ঘ রোগ-শয্যা, ভীষণ শারীরিক যন্ত্রণা তার দেহটাকে জয় করেছিল, মনকে পারেনি।

যেমন অসীম ছিল তার সহিষ্ণুতা, তেম্‌নি জ্বলন্ত ছিল তার ভগবানের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি। "দাদু! আমি দিন ভগবানকে বলি, ঠাকুর আমার রোগ সারিয়ে দাও। তিনি আমার রোগ নিশ্চয়ই সারিয়ে দেবেন।"

দেড় বছর যাবৎ ক্রমাগত প্রতি মুহূর্তে রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করে ক'জন লোক ভগবানের উপর এরূপ ঐকান্তিক ও সরল ভক্তি রাখতে পারে। বেতারের হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছিল, "আমাদের ছোট ভাই প্রফুল্লকে রোগমুক্ত করে দিন।"

এমনি ছিল তার মনের জোর যে সত্যই প্রফুল্ল—ভাল হতে আরম্ভ করেছিল। সেই সময় গল্প-দাদাকে পত্রে লিখেছিল যে "দাহ্ আমার এত ভাই-বোনের প্রার্থনা ভগবান না শুনে কি থাক্‌তে পারেন? এখন আমি উঠে বসতে পারি। বেশ ভাল আছি। আজ দেড় বছর এত ভালছিলাম না।"

সৃষ্টি-ছাড়া ছিল তার বিশ্বাস। পুত্রবৎসল কাতর পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে কাণে কাণে বলে গিছ্‌লো যে, "বাবা যদি যাই, আমি আবার আস্‌ব।" আজও তাই পুত্র-শোকাতুর পিতা-মাতা, তার জিনিষ-পত্র—তার খাট-বিছানা ও তার খেলনা, তার সখের জিনিষগুলি প্রফুল্ল থাকলে যেমনটী থাকত, ঠিক সেই ভাবেই সাজিয়ে রেখে অপেক্ষা করছেন।

প্রফুল্ল ছিল ঝামাপুকুর রাজবাটীর একমাত্র বংশধর। কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র মহাশয়ের এক-

মাত্র পুত্র। ২৪শে জানুয়ারী, ১৩১৬ সালে তার জন্ম। চলে যাবার সময় তার বয়স তের বৎসর কয়েক মাস হয়েছিল। হিন্দুস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত, তখন তার বয়স মাত্র বারো বছর। সেই সময় তার অসুখ হয়। অসুখের গোড়া লছমন ঝোলায় বরফের মত ঠাণ্ডা গঙ্গার জলে স্নান।

তার লছমন ঝোলার ভ্রমণ-কাহিনী অন্যান্য লেখার সঙ্গে এই গল্পের শেষে সন্নিবেশিত হইল। ভাষার সরলতায়, রচনা-মাধুর্য্যে, নিখুঁত প্রাকৃতিক চিত্রাঙ্কণে, সামান্য ঘটনার ভিতর দিয়া হাস্যরসের অবতারণায়, রাস্তা, দেশ, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত প্রভৃতির নিখুঁত ছবি, স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়ে তোলা, অকুণ্ঠিত ভাবে নিজেকে ও নিজের মনের ভাবকে পার্শ্বস্থিত দৃশ্য বা ঘটনাবলীর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া, এক বাঙ্গলার ভ্রমণ-কাহিনী প্রবর্ত্তক, রায় বাহাদুর জলধর সেনেরই বিশেষত্ব। বারো বছরের প্রফুল্লর লছমন ঝোলার ভ্রমণ-কাহিনীতে রায় বাহাদুরের মত পাকা সাহিত্যিকের সব গুণগুলোই অক্ষুণ্ণ ভাবে দেখতে পাই। সময় সময় মনে হয় কার লেখা পড়ছি—প্রফুল্লর না জলধর সেনের।

প্রফুল্ল অসামান্য প্রতিভা-সম্পন্ন ছিল। সে ছিল স্বভাব-কবি। কবিতা লেখায় কেমন সিদ্ধহস্ত ছিল—মনের ভাব কেমন সহজ কথায় সহজভাবে, ছন্দে গেঁথে দিতে পারত—তা এই ছোট চিঠিখানি থেকে বোঝা যায়। পিসতুতো বোন অমলা (তার ডাক নাম ছিল মেণ্টু) তাকে বাঙ্গালোর থেকে প্রফুল্ল লিখেছিল—

কল্যাণীয়া মেণ্টুরাণী—
ক্ষুদ্র তোমার পত্রখানি,
পৌঁছে গেছে আজকে ভোর
একেবারে বাঙ্গালোর।
ভাল আছি মোরা সবাই
তবে বাবার শরীর ভাল নাই
কেমন আছে দাদা-দিদি
জামাই বাবু, তুমি, রাধি।
লিখ মোরে বিশদভাবে
কিছু না যেন বাদ যাবে
আজকে তবে আসি ভাই
ইতি তোমার নন্দ ভাই।

(প্রফুল্লর ডাক নাম ছিল নন্দ)

১৩৩৭ সাল আশ্বিনের বিজয়া, প্রফুল্লরও শেষ বিজয়া। তাই বোধ হয় শিশু প্রফুল্লর প্রাণে নিজের বিজয়ার কথা অতর্কিত ভাবে কি এক অজানা ব্যথার রূপে ছন্দ প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

বোধনের করুণ-সুরে
আজ কেন ভাই ঘুম ভাঙ্গেরে।
সানাইয়ের করুণ-তানে
বেদন জাগায় প্রাণে প্রাণে।
চলেছে রঙ্গীন সাজে
আজকে বিজয়া যে।
হাসি আর কান্না-ভরা
আজ প্রভাতের বসুন্ধরা,
বিজয়ার কাঁদন গাওয়া
বেদনার সিক্ত হাওয়া,
হেম-কণা তায় বুলিয়ে দেওয়া
নিঝুম তরুর পাতায় পাতায়,
কমলের দলে দলে
বেদনা জাগায় টলে টলে।
ওরে ভাই আয়রে ছুটে
বেদনার অর্ঘ্য রচে পর্ণ-পুটে,

নিয়ে আয় বরণ-ডালা
কুসুমের পূর্ণ মালা,
মা যাবেন শম্ভু পাশে
কৈলাসের ওই শৈল-বাসে।
ওরে ভাই জোট করে আয়
চরণ-তলে অর্ঘ্য দিয়ে নিই বিদায়।

সে ছিল "মুক্তি-পথের অগ্রদূত" তাই বালক হলেও, ঋষি-কুমার নচিকেতার মত মৃত্যুকামী। বাংলার শিশু-দার্শনিক-কবির কাণে মৃত্যু তার বিভীষিকার কথা বল্‌ত না। মুক্তির কথা, অনন্তের কথা, ভগবানের কথা, প্রফুল্ল শুনতে পেত।

জগতের বড় বড় কবিরা পরিণত বয়সে, সামান্য ফুল বা প্রেম বা ভালবাসা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু শিশু কবি সে সব ছেড়ে, বিভীষিকাময় মৃত্যুটাকে খেলার জিনিষ সাব্যস্ত করে, তার ভিতর দিয়ে অনন্ত পথের ইঙ্গিত করে গেছে।

তার "মুক্তি-পথের যাত্রীতে" মৃত্যুকে প্রফুল্ল বিষাদ-কাতর শিউরে তোলা গান গেয়ে বরণ করে আনেনি। তার প্রাণে জেগেছিল নচিকেতার মত মৃত্যু-জয়ী অভয়-বাণী। ভাঙ্গা বীণা আর বাজবে না, বুঝ্‌তে

পেরেও, প্রফুল্ল তার মনের শান্তি হারায়নি। জ্ঞান-গরিষ্ঠ যোগীও বোধ হয় মৃত্যুকে এত তুচ্ছ ভাবতে পারে না, যত তুচ্ছ বালক প্রফুল্ল ভেবেছিল। তা আমরা দেখতে পাই তার "মুক্তিপথের যাত্রীতে"—

মুক্তি-পথের যাত্রী।

কোন্ সুদূরের গানটী এসে
করল আমায় আনমনা,
বিষাদ-কাতর শিউরে তোলা
তোমার ও গান শুনববনা॥
মুক্তি-পথের যাত্রী আমি
অন্তহীনের ওই পথে।
চল্‌বো আজি দীপ্ত হ'য়ে
থাক্‌বেনা কেউ মোর সাথে॥
জাগরণের সাড়া পেয়েও
ফিরবোনা আর আনন্দে,
অন্তে গিয়ে মুক্তি পেয়ে
পূজবো তাঁহায় অর্ঘ্য দে।
ভাঙ্গাবীণা বাজবে না আর
উদাস করা ওই সুরেই,

মুক্তি-পথের যাত্রী বলে
বরবো আমি শান্তিকেই।
দখিন্ বায়ের করুণ-পরশ
লাগবে গায়ে, অন্তরে,
শিউরে উঠে মুক্তি-গান
বাজবে কোন সপ্তুরে।
পাইনা গান পাইনা ভাষা
বোঝাতে ওই মুগ্ধদের,
নীরব ভাষায় বল্‌ছি ওরে
বিপথ থেকে ফেররে ফের।
ওতো তোদের লক্ষ্যই নয়
লক্ষ্য তোদের মুক্তিরে,
মুক্তি-পথের পথিক হ'তে
চাই হৃদয়ের শক্তিরে।
বিধির বিধি কাটিয়ে তোলা
শক্ত সেরূপ রে,
আমি মুক্তি-পথের পথিক বলেই
চাইবোনা ফিরে॥

প্রফুল্লর মনের ভিতরকার জাগ্রত ভগবান বুঝি বলিয়াছিল তাকে, যে সে অনন্ত-পথের যাত্রী। তাই প্রাণ ছিল তার

অনন্তের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। শেষের দিনের কথা প্রায় সকলের কাছে অন্ধকার ঘনাইয়া আনে, কিন্তু প্রফুল্লর কাছে আলোর ফোয়ারা খুলে দিয়েছিল। মনটা তাই তার আপনিই ছুটে ছিল জগত-পিতার পায়। ধন-দৌলত, সুখ-স্বাস্থ্য সে কিছুই চায় নি। প্রাণ খুলে সে চেয়েছিল, ঠাকুর! সুখ চাইনা, দুঃখ চাইনা, আমায় শান্তি-পথের পথিক কর। তার সরল প্রাণের সকল ব্যথা অন্তর্যামীকে জানিয়েছিল—'মৃত্যুকামীতে'—

আজ শেষের দিনে
স্নিগ্ধ মধুরিমা,
ছাপিয়ে পড়ে মুগ্ধ ছায়ায়
মন আকাশের অনন্ত ওই
সীমায়।

কি যেন সুখ।
যেন বসন্তের মধুর হিল্লোল
আবেশ ভরে ছাপিয়ে তোলে বুক।
আমি মৃত্যুকামী!
নিত্য কালের ঘাত-প্রতিঘাতে
ভগ্ন হ'য়ে ডাক্‌ছি তোমায় স্বামী।

শেষের দিনে ঘনিয়ে যবে আস্‌বে—

কালো ছায়া,

লুটিয়ে পড়ব পায়।

প্রাণের টানে আস্‌বে ছুটে তোমার তরী

মনের কিনারায়।

নৃত্য দোদুল ছন্দেতে মোর

ভরিয়ে তোল বুক।

শান্তি-পথের পথিক কোরো,

না চাই সুখ দুঃখ!

তখন আলো ছায়ার অন্তরাল থেকে

থাকবো হাওয়ার মিশে।

আমি মৃত্যুকামী।

"মৃত্যুকামী" এই পদ্যটীর নীচে প্রফুল্ল নিজের হাতে লিখে গেছে, মানকুমারী বসুর "ভিখারিণী মেয়ের" ছায়া অবলম্বনে।

সুবিধা ও অবসর পাইলে জগতের বড় বড় কবি ও সাহিত্যিক পরের জিনিষটী নিজের বলিয়া চালাবার প্রলোভন ছাড়তে পারেন নাই, ইহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা ও ইংরাজী-সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সরলমতি মৃত্যুকামী বালক প্রফুল্লর সে স্পৃহা হয়নি।

যখন ভাবি এক বারো বছরের ছেলে, রোগ-শয্যায় শুয়ে এরূপ ভাবে ভগবানকে ডাকতে পারে, তখন মনে হয় এ বালক কে? এই অপূর্ব্ব সাধনা, একি এ জন্মের সাধনা বা শিক্ষার ফল—না জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার। শাপভ্রষ্ট অভিমন্যুর মত, দু'দিনের জন্যে এসে, নিজ প্রতিভায় সকলকে মুগ্ধ করে অমরবাসে চলে গেল।

মৃত্যুকে ভয় করেনা এমন লোক বিরল—হোক না সে জ্ঞানী, যোগী, ঋষি। কিন্তু মৃত্যু প্রফুল্লর কাছে এক নূতন আলোর মালা নিয়ে তাকে বরণ করতে এসেছিল। মৃত্যুর জয়মাল্য কণ্ঠে নিয়ে প্রফুল্ল তার মনটাকে এমন করে গড়েছিল, যে তার গোনাদিন কটার প্রতি পদক্ষেপে, মৃত্যুর পদশব্দ, তার প্রাণে আতঙ্কের প্রতিধ্বনি তোলেনি। মৃত্যু প্রফুল্লকে কোন এক অজানা দেশের সন্ধান দিয়ে, নূতন আশায় তার বুক ভরিয়ে দিয়েছিল। রোগ-জীর্ণ মুমূর্ষু বালক, আমাদের কাছে তার প্রাণের ভিতরকার লুকানো কথা "সেথায় সবাই কিশোর, সবাই মুক্ত"— এমন এক দেশের কথা, অকুণ্ঠ ভাষায় বলে গেছে।

শেষের দিনে মনে হয়

ওগো আজি মহাকাল রাত্রি
আমি অনন্তের যাত্রী—

মৃত্যুর সেথা নাহি পরিচয়—
পাপিয়া-কূজন বাতাস ভরায়—
অজানা পরশ শিহর লাগায়
অন্তহীনের যাত্রী।
আজি মহাকাল রাত্রি।
সেথায় সবাই কিশোর, সবাই মুক্ত,
সবাই স্বাধীন, বিজয়-যুক্ত—
আমি বসে আছি জ্ঞান লুপ্ত
অন্তহীনের যাত্রী—
আজি মহাকাল রাত্রি।
সেথা নাই ভেদাভেদ নাই অজানা
কলহ সেথায় দেয়না হানা
মনে বাজে বুঝি সুর সাহানা
অন্তহীনের যাত্রী—
আজি মহাকাল রাত্রি—

কবি বালকের ইংরাজী কবিতার একটু নমুনা দিচ্ছি। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে জাতীয়-জীবনে যে প্রকাণ্ডআঘাত লেগেছিল, প্রফুল্লর প্রাণেও তাহা পৌঁছেছিল ;—

On demise of late Mr. C. R. Dass

(1)

Caring not for fame and glory,
Glorious son of fair Bengal,
Nobly hast thou served thy Country,
Hastening at the duties call.

(2)

Never shall your glory perish,
Though in mortal eye you fall,
Strong your memory, all will cherish,
Glorious son of fair Bengal.

(3)

Revered son of fair Bengal,
You are in this world no more,
Yet thy Sacred mem'ry I' dore,
Keep fresh in my heart for all.

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তার ইংরাজী ভাষার উপর, ছন্দের উপর দখল দেখ্‌লে মনে হয় না কি, যে প্রফুল্ল ক্ষণজন্মা

ছিল। এ রকম মেধাবী ও প্রতিভাবান্ ছেলে পৃথিবীর সব দেশেই অতি বিরল।

মৃত্যুর দেড় বছর পূর্ব্বে, প্রফুল্ল তার ঠাকুরদাদার সঙ্গে লছমণ ঝোলায় বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে প্রফুল্লদের বাড়ী আছে। সেইখানা হল সেদেশে বাঙালীর একমাত্র বাড়ী। লছমণ ঝোলা থেকে সে তার অকাল-মৃত্যুর বীজ এনেছিল। সৌন্দর্য্য—স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তাই তার কাল হয়েছিল।

লছমণ ঝোলায় গঙ্গার সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ প্রফুল্ল, বরফ-গলা জলে স্নান না করে তৃপ্ত হ'তে পারেনি। সে, অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভিতর—আপনাকে দর্শকরূপে রেখে তৃপ্ত হ'তে পারেনি। সৌন্দর্য্য বিহ্বল শিশু, বরফ-গলা জলে প্রাণ-ভরে ডুব দিয়ে উপভোগের পূর্ণমাত্রা উপলব্ধি করেছিল। এই উপভোগের দাম তার অমূল্য জীবন।

প্রফুল্ল যে শুধু, বাংলা, ইংরাজী কবিতা লিখ্‌তে পার্‌ত তা নয় ; সে যে কি পার্‌ত না তা জানিনা। যাতে তার মন গিয়েছে, যেটা তার সখ হয়েছে, যাতে সে হাত দিয়েছে, তাতেই সে তার নিজস্ব এমন একটা ছাপ দিয়ে গিয়েছে,—যে দেখ্‌লে মনে হয় যেন সেটা কোন একনিষ্ঠ

সাধকের কাজ—যেন সেইটাই ছিল তার একমাত্র শেখ্‌বার ও চর্চ্চা করবার জিনিষ।

প্রফুল্লর সখ হল ছবি আঁক্‌ব। জান্‌ত ত সে শুধু সামান্য ড্রয়িং। চতুর্থ শ্রেণীর ছেলে, এমন বেশী কি জানবে। কিন্তু তার জন্যে, তার ছবি আঁকবার কোন অসুবিধা হয় নি। ভগবান তাকে যে অপূর্ব্ব শক্তি দিয়াছিলেন, তাহা কোন বিশেষ শিক্ষা কি নকল-নবিশীর জন্যে অপেক্ষা করেনি বরং মাটীর নীচে প্রস্রবণ যেমন অবকাশ পেলেই, নিজের শক্তিতেই নিজে মাটী বা পাহাড় ফেটে প্রকাশ হয়, সেইরূপ প্রকাশ হয়েছিল।

ছোট ছেলে-মেয়ে যেমন হরেক রকম পুতুল, যা দেখে তাই গড়ে আর ভাঙ্গে, ভাঙ্গে আর গড়ে,—কিছুতেই খুসী নাই, গড়ারও শেষ নাই। প্রফুল্ল তেমনি যখন আঁকতে আরম্ভ করলে, সে যে কি না আঁকলে, তার ঠিক নাই। গাছ, পাতা, ফুল, পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, সমুদ্র, নৌকা, পান্‌সী, জাহাজ, ঘর, বাড়ী, দালান, প্রাসাদ, মন্দির, জীব, জন্তু, পশু, পক্ষী, ঠাকুর, দেবতা, মানুষ কত না সে এঁকে গেছে।

তাতে তার বোধ হয় মন উঠ্‌ল না। যখন যেখানে যায়, সেখানে যে কোন দৃশ্য তার চোখে ভাল লাগে, সেইটাকেই আঁকতে আরম্ভ করে।

পুরীতে গেল বেড়াতে। সেখানে চোখে লাগল তার সমুদ্র ও জগন্নাথদেবের মঠের মন্দির-শ্রেণী। প্রফুল্লর অব্যর্থ তুলি, সাদা টুপী মাথায়, লড়ায়ে ঢেউগুলো শুদ্ধ, অশান্ত সমুদ্রকে নিখুঁৎভাবে কাগজে তুলে আনলে। জগন্নাথের মন্দির অর্দ্ধেক নাগাত যখন তার তুলির আগায় ফুটে উঠেছে, তখন কোন কারণে পুরী থেকে চলে আসাতে সেখানে আর মন্দির আঁকা শেষ হ'ল না।

কল্‌কাতায় এসে আঁকা শেষ করবে এই ইচ্ছা। কিন্তু তা' আর করাও হ'ল না। তার পূর্ব্বেই ভগবান তাকে তাঁর কাছে ডেকে নিলেন। তার নিজের জীবনের মতন, দেব-মন্দিরের ছবি অসম্পূর্ণ পড়ে রইল। পুরী থেকে দাদুর জন্য ত কিছু নিদর্শন আনা চাই, তাই এই ছবিটা সে 'দাদু'কে দেবে বল্‌ত। তার পিতাঠাকুর মহাশয় সেই অসম্পূর্ণ ছবিটী গল্পদাদুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই ছবিটী দেখলে, মনে হয় প্রফুল্ল কি কোনদিন আবার এসে, তার হাতের কাজটা

শেষ করবে, না এই অসম্পূর্ণ ছবিটা তার অসম্পূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি হ'য়ে থাকবে। আমাদের শাস্ত্রে বলে বাসনা থাকতে মুক্তি হয় না। শাস্ত্রবাক্য কি মিথ্যা হবে ?

দার্জ্জিলিংএ গিয়ে সকলের চোখে যা লাগে, প্রফুল্লর চোখে তাই লেগেছিল। প্রফুল্ল শুধু চোখে দেখে খুসী হয়নি। চির-তুষার-ঢাকা পর্ব্বতমালার মনোরম দৃশ্য রংএর তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিল। ছবিটী এত সুন্দর যে দূর থেকে মনে হয় যেন সত্যিকারের বরফ-ঢাকা পাহাড়।

প্রফুল্ল যা দেখে তাই আঁকে। তাতেও তার মন উঠ্‌ল না। পড়তে পড়তে যেটা ভাল লাগে, সেইটা তুলিতে আনতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। তার আঁকা মেঘদূতের বিরহী যক্ষের স্ত্রীর ছবি দেখে মনে হয় ছবিটী কত বড় না চিত্রকরের তুলি থেকে বেরিয়েছে।

কয়েকখানা ছবি নমুনা-স্বরূপ এই বইতে দিলাম। তোমরা নিশ্চয়ই মনে করবে যে বার বছরের ছেলে—সামান্য ড্রয়িং ছাড়া কিছু শেখেনি—সে কি রকম ক'রে এমন আঁকলে। তোমরা কেন, অনেক বড় বড় চিত্রকর তার আঁকা দেখে, তার রং মেলাবার তারিফ করেছে,

তার তুলির বাহাদুরী দিয়েছে। প্রফুল্ল দু'দশখানা ছবি এঁকে যায়নি। তার এল্‌বাম্‌ তার আঁকা ছবিতে ভরা। সে এ-সব লুকিয়ে রাখত। তার পিতামাতা কেউ জানতেন না যে, প্রফুল্ল এমন আঁকতে পারে। শুধু আঁকা নয়, প্রফুল্ল যে এমন লিখতে পারে তাও সে কারুকে জানতে দেয় নি। ছোট গল্প লেখায় বার বছরের ছেলে কেমন সিদ্ধহস্ত ছিল তার গল্পগুলি থেকে বোঝা যায়।

লছমণ ঝোলা ভ্রমণ-কাহিনী

এবার গ্রীষ্মের ছুটীর প্রারম্ভেই আমাদের বেড়াতে যাবার সূচনা হলো। কেউ বল্লে দার্জ্জিলিং যাও বেশ জায়গা। এই ত সেখানে যাবার সময়। কেউ বল্লে মধুপুরে যাও, তোফা আরামে কাটিয়ে আসবে। এইরকম অনেকেই নানান্ জায়গার কথা বল্লে। অবশেষে লছমণ ঝোলায় যাবার ঠিক হলো। সেখানে সম্প্রতি আমাদের একখানি বাড়ী করা হয়েছে, কাজেই নিরিবিলি আরামে থাকা যাবে বলে, কেউ আর এতে প্রতিবাদ কল্লে না।

সোমবার দিন বাড়ী থেকে সন্ধ্যা—সাতটায় বেরুনো হলো। আটটার গাড়ী, সাড়ে-সাতটা নাগাদ হাওড়ায় গিয়ে পৌঁছে, ডেরাডুন এক্সপ্রেসে চড়া গেল, যথা সময়ে গার্ডের হুইশীল্ ও সবুজ নিশান দেখানোর সঙ্গে গাড়ী ধীরি ধীরি সর্প গতিতে ষ্টেশন ছেড়ে চলতে সুরু করলে। আমাদের যারা পৌঁছুতে এসে ছিলেন, এই কাকা, পিসে-মহাশয়, সবাই রুমাল নাড়তে লাগলেন।

"তোমায় স্মরি হে নিরুপম
• নৃত্য-রসে চিত্ত মম
উছল হয়

তারপর আমরা গাড়ীতে নির্ব্বিবাদে যে যার বেঞ্চে শুয়ে পড়লাম। তারপর ঘুম। মাঝে একদিন ও একরাত ট্রেণে থেকে ভোর পাঁচটায় হরিদ্বার ষ্টেশনে গাড়ী থামল। আমরাও তল্পীতল্পা নিয়ে গাড়ী থেকে নাবলুম। হরিদ্বার ষ্টেশনটী বেশ, ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে কিছুদূরে, মোটর, টাঙ্গা, ডাণ্ডী, সব দাঁড়িয়ে আছে। আর সামনে বাজার।

যা হোক আমাদের মোটর ঠিক করা ছিল (যদিও হৃষিকেশ যাবার অন্য উপায় আছে) তাতে চড়ে চল্লাম হৃষিকেশে, হরিদ্বার থেকে প্রায় পনের মাইল।

হৃষিকেশের বাজার ছাড়িয়ে প্রায় এক মাইল দূরে "মৌনি কিরেতি" বলে একটা জায়গা আছে, সেইখান পর্য্যন্ত মোটর যায়, সেইখান থেকে ডাণ্ডি করে লছমণ ঝোলা যেতে হয়। আমাদের মোটর প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে মৌনি কিরেতিতে এসে পৌছুলো, দু' জায়গায় গাড়ী থামে ছোট করে একখানি ঘর আছে, সেখানে টোল দিতে হয়, আমাদেরও দিতে হয়েছিল। আমরা মৌনি কিরেতিতে নেবে—আগে থাক্‌তে আমাদের ডাণ্ডি ঠিক করা ছিল, তাইতে চড়ে লছমণ ঝোলায় আমাদের বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। সেখান থেকে আমাদের বাড়ী প্রায় দুই মাইল

আড়াই মাইল হবে। পাহাড় কেটে রাস্তা, দু'ধারে পাহাড় ও গাছ, নানান্ ধরণের পাখী দেখ্তে দেখ্তে আমরা চল্লুম। সকাল আটটা,সাড়ে-আটটা নাগাত্ আমাদের বাড়ী পৌঁছুলুম। বাড়ীতে নেবে যে যার কাজ কর্ত্তে লেগে গেল, আমি ঘুরে ঘুরে চারদিকে দেখতে লাগলুম।

বাড়ীখানি ঠিক গঙ্গার উপর। সামনে পাহাড় তার কোলে গঙ্গা আর তার এপারে আমাদের বাড়ী। বাড়ীর বারান্দায় বসে গঙ্গা দেখ—বদ্রীনাথের যাত্রী সব নৌকা করে পার হচ্ছে, মুখে "বদ্রীবিশাল কি জয়" "গঙ্গা মায়ীকি জয়" বল্তে বল্তে যাচ্ছে, তাই দেখ। ওপারে ঠিক পাহাড়ের কোল দিয়ে যাবার রাস্তা। আমরা সেখানে দু'মাস ছিলুম, অনেক জায়গায় বেড়াতে যেতুম পরে বল্ব।

সেই রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে কতদূর চলে যেতুম। কি—আশ্চর্য্য। কল্‌কাতায় ত কখনও হেঁটে বেড়াইনি, এখানে এত বেড়ালে কষ্ট হবার কথা, কিন্তু মোটেই কষ্ট বোধ করতুম না।

পাহাড়ের সরু চড়াই বেয়ে নূতন নূতন যায়গায় যেতুম। একদিন গরুড়-চটী গেছ্লুম। কেমন সুন্দর নির্জ্জন যায়গা। একটী সুন্দর ঝরণা আছে—পাহাড়

দিয়ে ঘেরা, ঠিক যেন একটী মানুষের হাতের তৈরী করা বাথ-রুম। বেড়াবার এমন উৎসাহ যে, সেই সরু রাস্তা ধরে একদিন ফুলচটী গেছ্‌লুম,—ফুলচটী গরুড়চটী থেকে দু'মাইল। সেখানের দৃশ্যটী ভারি চমৎকার। ছোট চটী, কিন্তু জায়গাটী ভারি সুন্দর। সেখানে একজন সাধু থাকেন তিনিই চটী তদারক করেন, আমাকে কত আদর কল্লেন। তিনি একরকম সরবৎ তৈরী করে খেতে দিলেন, খেতে খুব চমৎকার, আমার অতখানি গিয়ে যে কষ্ট হচ্ছিল তখনি কষ্ট চলে গেল। আমি আবার অতখানি পথ ফিরে এলুম আমার কোনও কষ্ট হলো না।

লছমণ ঝোলার ওপারে "সত্য সেবাশ্রম" বলে একটী ছোট্ট ডাক্তারখানার মতন আছে। স্বামী কালিকানন্দ গিরি—তাঁরই আশ্রম, তাঁরই উৎসাহে তৈরী। সেখানকার যত পাহাড়ী গরীবদের অম্‌নি চিকিৎসা হয়—সেখানে একজন ডাক্তার বারোমাস থাকেন, বাঙ্গালী —তিনিও সাধু, তাঁর নাম "জ্ঞানানন্দ স্বামী।" তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন—রোজ পার হয়ে আমাদের বাড়ী আস্‌তেন—আমি রোজ সকালে ওপারে গিয়ে তাঁরই সঙ্গে বেড়াতে যেতুম। তিনি আর আমি দু'জনে যেতুম, মধ্যে মধ্যে দাদামণিও আমাদের সঙ্গে যেতেন।

একদিন আমি অনেক কবে দাদামণিকে নীলকণ্ঠ মহাদেব দেখ্‌তে যাবার জন্যে বল্‌তে, তিনি যাবার ঠিক করলেন। আমরা প্রায়ই সেই রাস্তায় যেতুম খানিকটা করে—"ভূতনাথ আশ্রম" বলে একটী সাধুর আশ্রম আছে, সেইখান পর্য্যন্ত। ছ'ধারে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য। ময়ূর. হরিণ সব পাহাড়ের উপর কেমন নির্ভয়ে বেড়াচ্ছে, দেখ্‌তুম, দেখে দেখে আমার খুব যাবার ইচ্ছা হতো। নীলকণ্ঠ মহাদেব যাবার রাস্তা হচ্ছে স্বর্গ-দ্বারের দিক দিয়ে, বদ্রীনারায়ণ যাবার দিক দিয়ে নয়। ওপারে গিয়ে দেখা যায় ছ'টো রাস্তা আছে। একটী টিহিরীর মহারাজের, অপরটী কোম্পানীর রাস্তা, একটী ফটক করা আছে। নীলকণ্ঠ যাবারও ছ'টো রাস্তা আছে, একটা পাকদণ্ডি—সেটা বড় সরু, আর একটা একটু সোজা ও চওড়া ডাণ্ডী যাবার। আমাদের ডাণ্ডী করে যাবার ঠিক করা হলো, অবশ্য সোজা রাস্তাটা দিয়ে।

আমাদের চারখানি ডাণ্ডী ঠিক করা হলো। সকাল সাড়ে-ছয়টার ভেতর বেরুণ গেল,—আমরা নৌকায় ওপারে গেলুম। আমাদের ডাণ্ডীগুলি আমাদের আগেই পার হ'য়ে ওপারে গিয়ে বসেছিল। আমরা তাইতে চড়লুম। আমি, দাতুমণি, আমার মা ও দাতু-মা

এই চারজন। চারখানা ডাণ্ডীই একসঙ্গে চল্‌তে লাগল। সে যে কি সুন্দর রাস্তার দৃশ্য—দু'ধারে ছোট ছোট কুঁড়ে, এক-একটী সাধুর আশ্রম, তাঁরা সকলেই আশ্রমের সামনে একবার করে দাঁড়িয়ে "নমো নারায়ণায়ঃ" উচ্চারণ ক'রে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "কোথায় যাওয়া হবে।" আমাদেরও কাজেই নেবে নেবে যেতে হচ্ছিলো, সকলেই রাস্তার কথা বলে দিতে লাগলেন। আমরা আগে শুনেছিলুম পাহাড়ের ওপর হাতী বেরোয়, কাজেই তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে সকলেই বল্‌তে লাগলেন,—হ্যাঁ বেরোয় ও মাঝে মাঝে রাত্রে এ দিকেও আসে, তবে মানুষ সামনে না পড়লে কিছু বলে না।"

আমরা চল্লুম, ক্রমশঃ সাধুদের আশ্রমগুলি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে পাহাড় আর গাছ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্ছি—এমন সময় একটা মশ্‌ মশ্‌ শব্দ শোনা গেল,—হ্যাঁ, রাস্তার দু'ধারে বাঁশবন খুব বেশী ও বেলগাছ। এখন সেই শব্দ শুনে আমাদের সামনের ডাণ্ডীওলাগুলো একেবারে থেমে গেল। থেমে গিয়ে দেখে, প্রায় হাত-কুড়ি দূরে—বাঁশঝাড়ের ভেতর একটী হাতী তার বিরাট দেহ নিয়ে আপন মনে বাঁশঝাড় চিবুচ্ছেন, তারই আওয়াজ হচ্ছে মশ্‌ মশ্‌।

এখন হয়েছে কি সামনের ডাণ্ডীওলাগুলো থামতেই, পেছুনের ডাণ্ডীওলাগুলো, একেবারে একসঙ্গে সকলে তাদের পাহাড়ী ভাষায় চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠ্‌লো "কি হয়েছে।" সেই গোল না শুনে—হস্তী-মশাই একেবারে সামনে ফিরে দাঁড়ালেন,—যেন জিজ্ঞাসা করতে "হ্যাঁ হয়েছে কি"—ওরাও যখন চেঁচিয়ে উঠেছে, ময়ূরগুলোও গাছের ওপর থেকে ডেকে উঠেছে, তাইতে আরও শব্দটা বেশী হয়ে উঠেছিল। হাতীকে সামনে ফিরতে দেখে, ডাণ্ডীওলাগুলো—"হাতী হ্যায়" না বলে, ডাণ্ডীশুদ্ধ চোঁ-চাঁ দৌড়। একেবারে সব একদমে দৌড়ে যেখানে ভূতনাথ আশ্রম সেখানে এসে থামলো। থেমেই ডাণ্ডীগুলোকে রেখেই খুব হাঁপাতে লাগলো, আমরাও একরকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে, কি যে হলো ঠিক করতে পার্‌লুম না। তবে আমরা হাতীটাকে স্পষ্ট দেখিনি তার আওয়াজ শুনেছিলুম, কেবল আমার মায়ের ডাণ্ডীখানি আগে ছিল, তিনিই হাতীটাকে স্পষ্ট দেখেছিলেন।

যা হ'ক্ আমাদের আর নীলকণ্ঠ মহাদেব যাওয়া হলো না। ভূতনাথ আশ্রমে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে আসা হলো।

এই রকম রোজ হেঁটে বেড়িয়ে, গঙ্গায় নৌকা করে

বেড়িয়ে, কোথা দিয়ে যে দিন কেটে যেত জানতেই পার্‌তুম না।

একদিন পাণ্ডব-কুয়া দেখতে গেছ্‌লুম। গঙ্গার মাঝে ছোট একটী পাহাড় তার মাঝখানে কূয়ার মতন আছে। প্রবাদ পাণ্ডবেরা এটা করে ছিলেন,—ভীম বোধ হয় করে ছিলেন। পাণ্ডব-কূয়ায় নৌকা করে যেতে হয়।

এরপর আমার একজামিনের সময় আস্‌ছে, ছুটীর পরই একজামিন হবে, কাজেই মাষ্টার-মশায়ের চিঠি ও বাবার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাদুমণিকে বল্‌তেই তিনি আসবার ঠিক কল্লেন। আসবার দিন গঙ্গায় চান কর্‌লুম, আমি দু'মাসে দু'দিন গঙ্গায় চান করেছিলুম। গঙ্গা দেখলেই নাইতে ইচ্ছা হতো, কিন্তু দাদুমণি বারণ করতেন, সে গঙ্গার জল খুব পরিষ্কার আর ঠিক বরফের মত ঠাণ্ডা।

গঙ্গায় নেয়ে, আমার সব বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঠিক হয়ে রইলুম। হ্যাঁ বল্‌তে ভুল হয়েছে, আমার আর দু'টী বন্ধু হয়েছিল, দু'টী কিস্তিবালি—তাদের নাম লালু ও ভুলু, নৌকা পার করে। তারা রোজ আমায় বাঁশী বাজিয়ে শোনাত, তাদের মন খুব সরল, আমার তাদের খুব ভাল লাগ্‌ত, আমি আসবার সময় তারা কাঁদতে লাগল, আমি প্রায় কেঁদে'ফেলে ছিলুম। বেলা সাড়ে-

এগারটার সময় আমরা ডাণ্ডী করে ফের মৌনি কিরেতিতে এসে, আবার মোটরে করে হরিদ্বার দিয়ে এলুম।

আসবার সময় অবশ্য আমাদের খুবই মন কেমন করছিলো, অনেকেই আমাদের সঙ্গে মৌনি কিরেতি পর্য্যন্ত এসেছিলেন।

বেলা সাড়ে-পাঁচটার সময় হরিদ্বার পর্য্যন্ত এলুম। আর রাত্রি সাড়ে-আটটায় ট্রেণ। আমরা আমাদের তল্পী-তল্পা ওয়েটিং-রুমে রেখে, সহরটা ঘুরে, বেড়িয়ে আস্‌তে গেলুম। সহর দেখে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলুম। হরিদ্বারে গঙ্গা দেখ্‌তে খুবই স্নুন্দর! রোজ সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে গঙ্গার আরতি হয়। দেখ্‌তে ভারি চমৎকার। সেখানকার ঠাকুর হচ্ছেন গঙ্গা, আমরা আরতি দেখ্‌লুম। ব্রহ্মকুণ্ডের আর একটি নাম "হর্‌কিপীতি" মানে হরির বসিবার স্থান। সে সব দেখে সাড়ে-সাতটার সময় ওয়েটিং-রুমে এসে—আমাদের সঙ্গে খাবার ছিল, সেই খেয়ে নিয়ে ট্রেণের জন্যে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লুম। ট্রেণ আস্‌তেই আমরা সকলেই উঠে বস্‌লুম। ক্রমশঃ ট্রেণ আস্তে আস্তে চল্‌তে স্নুরু করলে, আর আমাদের সামনে থেকে আস্তে আস্তে

হরিদ্বার সরে যেতে লাগ্‌ল। তারপর গাড়ী পুরো চল্‌তেই আমরা যে যার জায়গায় শুয়ে বাড়ীর কথা ও লছমণ ঝোলার কথা ভাবতে লাগ্‌লুম। আনন্দ ও ব্যথা দু'টোই হতে লাগল একসঙ্গে। এইখানে আমাদের লছমণ ঝোলা বেড়াতে যাওয়া শেষ হলো।

মিনু

তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল।

কলিকাতার কোন এক গলিতে একটি ছোট বাড়ী হইতে পরেশবাবুর স্ত্রীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল।

তিনি বলিতেছিলেন, "হ্যাঁরে মিনু, বেলা যে যায়, উঠে ঘর সাফ্ করে রান্নাবান্না কর্‌বি কখন?

"আজ আবার উনি আফিস্ থেকে এলে থিয়েটারে যাবার কথা আছে। আস্‌তে ন'টা হবে। সমস্ত কাজ সেরে, রান্না-বান্না করে, খোকাকে দুধ খাইয়ে—ঘুম পাড়িয়ে রাখ্‌বি। যেন কিছু গোল হয় না—হ'লে মেরে পিটের ছাল তুলে দেব।

ওঠ্ পোড়ার-মুখী—ওঠ্ তিন পো'র বেলা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমুবে—বুড়ো-ধাড়ি মেয়ে!"

বলিতে বলিতে তিনি নিজে কাপড়-চোপড় পরতে ঘরে গেলেন।· মিনু বেচারা চোখ মুছ্‌তে-মুছ্‌তে উঠে গেল।

পরেশবাবু একজন সামান্য গৃহস্থ। তাঁর দ্বিতীয়

পক্ষের স্ত্রীর নাম বিমলা—তিনি বড় ভাল লোক ন'ন। তাঁর একমাত্র সন্তান—আদরের অমল ওর্‌ফে অমুকে ছাড়া আর কাউকে তিনি ভালবাস্‌তেন না। মিনুর ত কথাই নেই—একে সতীনের মেয়ে—তার উপর মা-হারা—প্রতিবাদ কর্‌বার কেউ নেই।

পরেশবাবু প্রথম প্রথম কিছু বল্‌তেন। শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন—বিমলার অখণ্ড প্রতাপের কাছে। কাজেই মিনুকে নির্ব্বিবাদে সকল অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য কর্‌তে হ'ত। উপরন্তু হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর উপর দু'বেলা পেটভরা ভাতও জুট্‌ত না। বেচারী নির্জ্জনে ব'সে কাঁদ্‌ত আর তার স্বর্গগতা মায়ের কাছে নালিশ জানাত।

গৃহিণী সাজিয়া-গুজিয়া অমুকে মিনুর হাতে দিলেন। অমুর বয়স মোটে এক বৎসর কাজেই সে থিয়েটারে যাবেনা। তিনি খোকার সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃমিনুকে সতর্ক করে স্বামীর সঙ্গে গাড়ীতে উঠ্‌লেন।

মিনু অমুকে কোলে নিয়ে ছল্ ছল্ চোখে দুয়ারে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খোকাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে কাজ কর্‌তে উঠে গেল। কাজ সারিয়া রান্না-বান্না করিয়া খোকাকে আবার দুধ খাওয়াল। তারপর খোকাকে ঘুম পাড়াবার জন্য তাকে 'নিয়ে জানালার ধারে বস্‌ল।

খোকা হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। মিনু তার আগেকার কথা ভাব্‌তে লাগ্‌ল। তার মৃতা মা'র কথা—অতীতে হারিয়ে যাওয়া আদরের কথা—তার মনে পড়্‌ল।

তার মা সবে ত দু'বছর গেছেন—ভাব্‌তে গিয়ে তার দু'চোখ জলে ভরে এলো। তারপর খোকাকে কোলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

এদিকে পরেশবাবু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যখন বাড়ী ফির্‌লেন—বাড়ীর সাম্‌নে এসে যা দেখ্‌লেন তা'তে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

তাঁদের সেই ছোট বাড়ীতে আগুন ধরেছে। বাড়ীটা প্রায় পুড়ে গেছে। বিমলা পাগলের মত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন তাঁর প্রাণের অমুকে বোধহয় আর পাবেন না। সে বোধহয় চির-জীবনের মত তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে।

তিনি সেই পোড়া বাড়ীটা তন্ন তন্ন করে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন। একটা ঘর অল্প পুড়েছিল সেখানে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর আনন্দে চীৎকার করে উঠ্‌লেন।

তিনি দেখ্‌লেন—ঘরের একটা কোণে মিনু অমুকে

জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে—তার সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌সে পুড়ে গেছে। আর অমু তার বুকের ভিতর শুয়ে আঙ্গুল চুষ্‌ছে। সেও একটু ঝল্‌সে গেছে। তিনি তাকে কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লেন।

আর মিনু—তখন সে তার মার কাছে চলে গেছ্‌ল—তার মুখের মৃদু হাসি তখনও মিলিয়ে যায়নি।

বন্ধুর দান

অস্তমিত তপনের লোহিতাভ কিরণ-জালে জগত এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।

কতকগুলি বালক মাঠ হইতে খেলিয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের মধ্যে দুইজনে খুব তর্ক হইতেছিল। কথা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল।

গৌরবর্ণ বালকটি আর রাগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া অপরকে মারিল। সকলে ছিঃ ছিঃ করিয়া উঠিল। অপর বালকটি কিছুই বলিল না। অন্যের অলক্ষ্যে জামার আস্তিনে চোখ মুছিল।

এক্ষণে ইহাদের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ফর্সা ছেলেটির নাম—অমিয়কুমার বসু, অন্য ছেলেটির নাম দিলীপকুমার ঘোষ, উভয়েই এক পাঠশালায় পড়ে। খেলায় ও পড়ায় দু'জনাই সমকক্ষ। খেলায় তাহাদের সহিত কেহ পারিত না। যাহা হোক্ ঝগড়া মিটিয়া গেল। কিন্তু কথা বন্ধ রহিল। তাহার পর হইতে তাহাদিগকে কেহ পরস্পরের সহিত কথা কহিতে দেখে নাই।

অমিয় কিন্তু দিলীপকে নানারূপে উৎপীড়ন করিত। সে কিছুই বলিত না। ইহাতে সকলেই অমিয়ের উপর বিরক্ত হইত।

একদিন দিঘীর পাড়ে খেলিতে খেলিতে অমিয় এম্‌নি ধাক্কা মারিল যে, দিলীপ গড়াইয়া জলে পড়িল। অনেক কষ্টে তাহাকে উদ্ধার করা হইল। সে কিন্তু একটুও উচ্চ-বাচ্যও করিল না।

(২)

তাহার পর আজ সুদীর্ঘ দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। কালের কত চিহ্নই মর-জগত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গলা-দেশের অবস্থা ভয়ানক। চোর-ডাকাতের রামরাজত্ব চলিতেছিল। কলিকাতা সহরে পুলিশ নাগরিকগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সকলেই ভয়ে ত্রস্ত, সহজে কেহ সন্ধ্যার পর পথে বাহির হইতে চাহে না। জনবহুল কলিকাতা তখন নির্জ্জন।

এম্‌নি যখন অবস্থা, তখন একদিন, রাত্রিকালে এক বৃহৎ প্রাসাদোপম অট্টালিকায়, দুইটি লোক কতকগুলি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিল। কক্ষটি নির্জ্জন।

ইহা ভূগর্ভে অবস্থিত। বলা বাহুল্য ইহা একটি তৎকালীন ডাকাতের আড্ডা। বিধাতার কি অপূর্ব্ব মহিমা!

আমাদের পূর্ব্বকথিত লোক ছ'টির নাম—অমিয় ও দিলীপ। তাহাদের আবার মিলন হইয়াছিল, তবে ছদ্মবেশে অর্থাৎ দিলীপ তড়িৎ নাম ধারণ করিয়া তাহার কাছে চাক্‌রি লইয়াছিল। এবং অল্পদিনে এতই বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিল যে, অমিয় তাহাকে তাহার এ্যাসিস্‌টাণ্ট করিয়া লইল। এমন কি ভূগর্ভস্থ ঘরের চাবিটি পর্য্যন্ত তাহার নিকট থাকিত। ঐ চাবি ছাড়া নীচে যাইবার উপায় ছিল না! কিম্বা সুড়ঙ্গ দিয়া বাহিরে যাবার অন্য পথ ছিল না।

ভূগর্ভস্থ গৃহটী এতই সুরক্ষিত ও গুপ্তভাবে অবস্থিত যে পুলিশ সহস্র চেষ্টাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

(৩)

একদিন প্রভাতে যখন তরুণ-অরুণ তাহার হেমাভ মহিমা বিকীর্ণ করিতেছিলেন, তখন সেই পাষাণময়ী অট্টালিকার চতুঃপার্শ্বস্থ অধিবাসিগণ, নিদ্রাভঙ্গে, ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিলেন।

সেই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে ইংরাজ-সৈন্য—আদেশের প্রতীক্ষায় বন্দুক-হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদের তেজোদীপ্ত ভাব নাগরিকগণের মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছিল। তাহাদের সুতীক্ষ্ণ বেওনেট ও ধাতুময় সাজ সূর্য্য কিরণে প্রতিফলিত হইয়া ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল। সেনানায়ক সেই পাষাণপুরীর লৌহ-দ্বার ভাঙ্গিতে আদেশ দিলেন। সৈন্যগণ ভৈরব-হুঙ্কারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে দ্বিতলের এক নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া অমিয়-কুমার কাহার প্রতীক্ষায় দ্বারের দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিতেছিল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; ভূগর্ভের চাবী তাহার কাছে তখন ছিল না, থাকিলে কখনই ভাবনা থাকিত না। চাবী তখন তড়িতের কাছে—সে কোন কার্য্যে বাহিরে গিয়াছিল।

অমিয় জানিত যে পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারিলে নিশ্চয়ই ফাঁসি দিবে। বাহিরে ভীষণ শব্দ হইতেছিল, দরজা ক্রমেই ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। সৈন্যগণের চীৎকার ও উল্লাসে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

হঠাৎ একটি দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ যুবককে অট্টালিকার দিকে দৌড়াইতে এবং পরক্ষণেই কি একটা দ্বিতলের জানলা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে দেখা গেল। সঙ্গে-সঙ্গেই

সুদক্ষ সৈনিকের অব্যর্থ গুলিতে তাহার রক্তাক্ত দেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইল—সে ইহ-জীবনের মত বিদায় গ্রহণ করিল। এই সেই তড়িৎকুমার।

এদিকে অমিয় কিছু ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া হতাশায় চক্ষু মুছিল। বিশ্বের রূপ, রস, গন্ধ সবই মুছিয়া গেল!

কিন্তু—ওকি! বন্দুকের শব্দ কেন? সঙ্গে-সঙ্গেই জানালার কাঁচ ভাঙ্গিয়া কি একটা গড়াইয়া তাহার কাছে আসিল।

অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত তুলিয়া লইয়া দেখিল একটি পাথর-জড়ান রুমাল। রুমালখানি তড়িতের। তাহার মধ্যে ভূগর্ভ-বাহিরে যাইবার যে পথ—তাহারই চাবী।

রুমালখানির একটি কোণে লেখা—"দিলীপ"।

অভাগা বা ক্রোধের পরিণাম

পরেশবাবুর দুই ছেলে। বড়টির নাম 'অমল' ছোটটির নাম 'অজয়'। অমলের মত ভাল ছেলে সে-পাড়ায় আর কেউ ছিল না। সবাই তাকে ভালবাসে—তার বাবার ত' কথাই নেই।

কিন্তু হ'লে কি হ'বে? অমল ছিল পরেশবাবুর কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে—আর অজয় ছিল তাঁর নিজের ছেলে। পরেশবাবু কিন্তু দু'জনকেই সমান ভালবাস্তেন। অজয়ের মা বিমলা দেবীর তা মোটেই সইত না।

বিমলা ভাব্তেন কি ক'রে অমলকে জব্দ করা যায়—স্বামীর মনটা কি ক'রে তার বিরুদ্ধে বিগ্ড়ে দেওয়া যায়।

* * * * * *
* * *

একদিন আফিস ফেরত বাড়িতে ঢুকেই পরেশ-বাবু ত্রস্তকণ্ঠে ডাক্লেন—"অমু—অমু"। উত্তর এলো—"যা—ই—ঈ"।

একটুবাদে অমু—ওর্‌ফে অমল পরেশ বাবুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে—"আমায় ডাক্‌ছিলে বাবা ?" পরেশবাবু ধপ্ ক'রে বসে পড়ে বল্লেন—"হ্যাঁ, বাবা অমু—তুমি কি আমার লাল রংয়ের বই বা খাতা নিয়েছ ?"

অমল বল্লে—"কৈ নিইনি ত"—এম্‌ন সময়ে পরেশ-বাবুর স্ত্রী 'বিমলা দেবী' জল-খাবার নিয়ে ঘরে ঢুক্‌লেন। একটু যেন বিস্মিত হ'য়ে বল্লেন—"একি ! এখনও জামা-কাপড় ছাড়নি যে ? ব্যাপার কি ?"

পরেশবাবু একটু হতাশ হ'য়ে বল্লেন—"বিমলা—সর্ব্বনাশ হয়েছে—আমায় বুঝি এখন জেলে যেতে হয়।" বিমলা দেবী বলে উঠ্‌লেন—"সে কি ! কেন, কি হয়েছে ?" পরেশবাবু বল্লেন—"কাল ভুল করে চেক্ বইখানা আফিস থেকে খাতাপত্তরের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম—আজ আবার ভুল ক'রে নিয়ে যাইনি।" কিন্তু বিমলা, এখন এসে দেখ্‌ছি যেখানে রেখেছিলাম সেখানে নেই। এখন উপায় কি হবে ?"

—বিমলা দেবী একটা বিস্ময়-সূচক দৃষ্টি হেনে বল্লেন—"বল কি গো—অমলকে যে আমি দেখেছিলুম একটা লাল বই নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'চ্ছিল, কেন সে ও-বইটা তোমায় দেয়নি।"

এই কথা শুনে পরেশবাবু অসম্ভব রেগে ভাব্‌লেন—কি অমল আমার কাছে মিথ্যা বলে—এত তার দুঃসাহস। তাকে ত' সেভাবে গঠিত করিনি।

তাঁর তখন দশ বা এগার বছর আগেকার কথা মনে হ'লো। সেকথা প্রায় একরকম মন হ'তে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। যখন তাঁদের গ্রামে বেড়াতে গিয়ে এক দেবশিশু কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তখন উভয়েরই কি আনন্দ কি আহ্লাদ। তখন সেই দেবশিশুর সুন্দর মুখে কালিমার রেখাপাত তিনি দেখেননি। অমলকে তিনি নিজের ছেলে বলেই ভাব্‌তেন।

আর আজ অমল—সেই দশ এগার বছর আগেকার দেবশিশু, কি ক'রে এমন মিথ্যাবাদী হ'লো! রোস্‌ আজ আমি তাকে ভালভাবে শিক্ষা দেব! রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"অমল তোমার মা যা বল্‌ছেন—তা' সত্যি?"

বিমলার কথা শুনে আর পরেশবাবুর রাগ দেখে, অমল গেছ্‌ল একেবারে ভড়্‌কে—তবুও তার বিস্ময়ভরা জল-ভারাক্রান্ত চোখ দু'টী মা'র মুখপানে রেখে বল্লে—"না মা আমি ত' নেইনি"। পরে পরেশবাবুর দিকে চেয়ে বল্লে—"না বাবা—সত্যি আমি নেইনি।" পরেশ-

বাবু তখন রাগে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। অমলের কথা শেষ হ'তে না হ'তে তার গালে এক প্রকাণ্ড চড় বসিয়ে দিলেন। অমল গেল মাটিতে পড়ে।

আসল ব্যাপারটি হয়েছিল এই—বিমলা দেবী ঘর গুছাতে এসে ঐ চেক্ বইটা দেখে, পরেশবাবুর কোটের আণ্ডার পকেটে রেখে দিয়েছিলেন। পরেশবাবু সে জামা প'রে সেদিন আফিসে যান। কাজেই সেই খাতাটি পকেটেই ছিল, কিন্তু অমলকে একটু মার খাওয়াবার জন্যে বিমলা মিথ্যে ক'রে পরেশবাবুর কাছে লাগিয়ে দিলেন।

* * * * * *
* * *

অমলের মা'র খাবার পর দু'ঘণ্টা কেটে গেছে—এখনও তার জ্ঞান হয়নি। ডাক্তার ডাকা হ'য়েছে। ডাক্তারের অনেক চেষ্টায়—তার জ্ঞান সঞ্চার একটু হ'লো। কিন্তু "বাবা আমি নিইনি" বলেই, সে আবার চীৎকার ক'রে উঠ্ল এবং পরক্ষণেই আবার অজ্ঞান হ'য়ে গেল।

সবাই মিলে আবার তাকে শুশ্রূষা কর্ত্তে লাগ্ল এবং অনেকক্ষণবাদে সে জ্ঞান ফিরে পেল।

ডাক্তার তাকে ঘুমাতে ব'লে চলে যাচ্ছিলেন, তখন অমলের বাবা ভিজিটের টাকা দেবার জন্যে তাঁর সেই কোর্টের পকেটে হাত দিতে—হাতে একটা বাঁধান বই ঠেক্‌ল—তক্ষুণি সব ব্যাপার বুঝ্‌তে পার্‌লেন।

ডাক্তারকে ভিজিট দিয়ে বিদায় দিলেন। বিমলাকে কিছুই বল্লেন না।

তার পরদিন অমলের জ্বর হ'লো। সেই জ্বর ক্রমশঃ বিকারে দাঁড়াল। ডাক্তার এসে ওষুধ দিলেন অনেক চেষ্টা কল্লেন—কিন্তু কিছুতেই অমল ভাল হ'লো না। অমল প্রলাপ বক্‌তে সুরু কল্লে—"বাবা আমি নিইনি—আমায় মেরো না।"

"মা আমি নিইনি"—বল্‌তে বল্‌তে অস্তগামী সূর্য্যের সাথে অমলেরও শেষ নিশ্বাস বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেল।

* * * * * *
* * *

বিমলাদেবী তখন আর ঠিক্ থাক্‌তে পার্‌লেন না। তিনি আর্ত্তরবে কেঁদে উঠ্‌লেন।

পরেশবাবু নির্ব্বাক—নিস্পন্দ।

তারপর হ'তে আর পরেশবাবুর মত স্ফূর্ত্তিবাজ

লোক্‌কে কেউ হাঁসতে দেখেনি। তাঁর সর্ব্বদা অমলের শেষ কথা মনে হ'তো—"বাবা আমি নিইনে—সত্যি বল্‌ছি—আমায় মেরোনা"—

একদিন একটুখানি রাগের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে সারা-জীবন ধ'রে কত্তে হ'য়েছিল।

এ্যাড্‌ভেঞ্চার্‌

পিরিওডিকাল্‌ এগ্‌জামিন্‌ হ'য়ে গেছে।

ভয়ঙ্কর গরম। ক্লাসে কোন কাজ নেই। সব মাষ্টারেরা ক্লাসে এসে পা তুলে ঘুমুবেন। কাজেই দু'-একজন গো-বেচারা ছাড়া অন্য সকলে রোজকার মত জট্‌লা কচ্ছিল—

—ব্যাপারটা গ্রীষ্মের ছুটিতে কি রকম এ্যাড্‌ভেঞ্চার করা যায়। সকলেই নানান্‌ কথা বল্‌ছে।

এমন সময় নিতু পিট্‌-পিট্‌ ক'রে এদিক ওদিক চেয়ে দেখে দেখ্‌লে—মাষ্টার-মশা'য় দিব্বি আরামে ঘুমুচ্ছেন। পা দু'টো টেবিলের উপর। ঘাড়টা চেয়ারের উপর হেলে পড়েছে। নাক দু'টো সমানভাবে পাল্লা দিয়ে ডাক্‌তে সুরু করেছে। আর উপরে টানাপাখা বেশ জোরেই চল্‌ছে।

গলাটা কেশে সাফ্‌ করে বিজ্ঞের মতন হ'য়ে নিতু বল্লে—"দেখ্‌ টুলু—আমি ভাই একটা জিনিস বের করেছি।"

সবাই হাঁ-হাঁ ক'রে নিতুর কাছে সরে এল।

শ্রোতৃমণ্ডলের উপর চট্ ক'রে একবার চোখ বুলিয়ে গম্ভীরভাবে নিতাই বল্লে—"দেখ্ এ গ্রামে ত' কোন থিয়েটার পার্টি নেই। তা' আমরা থিয়েটার কর্ব্বো। গ্রামের প্রত্যেক ছেলেকে নেমতন্ন কর্ব্বো। শুধু ভজার দলকে নেমতন্ন করা হবে না—আমরা ওদের বয়কট্ কল্লুম। ওরা দেখুক যে আমরাও ও-রকম ঢের কত্তে পারি। ভারি ত' এক তাসের ম্যাজিক্ দেখিয়ে পাড়া তোলপাড় ক'রে তুলেছিল্ ব'লে, আমাদের সাথে আর কথাই বলেনা।"

কেউ আর নিতুর কথার প্রতিবাদ কল্লে না। অবশেষে থিয়েটার করাই ঠিক্ হ'লো।

তবে কি পালা হ'বে তাই ঠিক্ ক'রে উঠ্তে পার্লেনা। সবাই নিতুকে ধ'রে বস্লো।

নিতু তৈরী ছিল বল্লে,—দেখ্ আমি একটা থিয়েটারের বই লিখেছি—এই ব'লে ছোট একটা খাতা পকেট থেকে বের ক'রে দেখালে।

ঠিক্ হ'লো—নিতুর বইটাই করা যাবে—তবে রবিবার নিতু তার বইটা আমাদের একবার পড়ে শোনাবে।

ছুটী হ'য়ে গেল। সবাই হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলো।

একটানা স্কুল ঘরে বন্ধ থেকে মুক্ত গ্রাম্য বালকেরা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল।

* * * * * *
* * *

(বোধহয় শ্রীমান্ প্রফুল্লের আরো লিখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ফুল ফোট্‌বার আগেই ঝ'রে গেল। এ গল্পটা শেষ কর্‌বার আগেই প্রফুল্ল এই পৃথিবীর আলো-বাতাস ত্যাগ ক'রে মরণের ওপারে গিয়েছিল। তাই এরপর আর কিছু লেখা নেই।)